আলিপুর বার্তা

শারদীয় ১৪২৯

সূচিপত্র

পুরান

সহজিয়া প্রেম নিকষিত হেম- কৃষ্ণচন্দ্র দে ৭

আধ্যাত্মিক

পরমা প্রকৃতি মা সারদামণি- তপতী দেবী ১১

রম্যগল্প

আর কতকাল রইবো বসে – সুকুমার মণ্ডল ১৩

গল্প

অভিনব প্যানচেট- পার্থসারথী গুহ ১৭, পরী পিসির পুঁটুলি- দেবাশিষ রায় ২৩, অবসর- পুণ্যব্রত রায় ২৭, ভাঙা সাঁকো- অরিন্দম আচার্য ৩৩, যত্তসব- সিদ্ধার্থ সিংহ ৪১, দ্বন্দ্ব- শর্মিষ্ঠা সাহা ৪৯, নিঃশর্ত আনুগত্য- দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ৫৫, ও! মাই গড- মানস সরকার ৬১, হাট-বাজারের আশীর্বাদ- অবশেষ দাস ৬৩, বেটার চান্স- প্রণব গুহ ৬৯

কবিতা

এক মুঠো আকাশ- শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৭৩, বেঁচে থাকা- সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী ৭৩, নীল সরস্বতী- অরুণ পাঠক ৭৪, আমি ছড়ার পাখি- মানস চক্রবর্তী ৭৪, রাতবিরেতে- দীপ মুখোপাধ্যায় ৭৫, উন্নয়নের নমুনা- সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৭৫, পাতাল- মধুবন চক্রবর্তী ৭৫, শব্দ- কল্যাণ রায়চৌধুরী ৭৬, দাগ- তাজিমুর রহমান ৭৬, গাছ-শৌভিক গাঙ্গুলী ৭৬, প্রিয় মিত্র-মৃত্যু- কুনাল মালিক ৭৭, মোনালিসা- মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ৭৭, রবীন্দ্রসদন- মিলি দাস ৭৮, কবিতাঞ্জলী- পার্থ সারথী ঘোষ ৭৮

বিশেষ রচনা

আঠারো ভাটির দেশের শারদোৎসব- উজ্জ্বল সরদার ৭৯

প্রবন্ধ

স্বভাব সন্ন্যাসী সুভাষ- ড. জয়ন্ত চৌধুরী ৮৩

জানবাজার ও বাওয়ালীর জমিদার পরিবারদ্বয়ের বৈবাহিক সম্পর্কের ইতিহাস- পাঁচুগোপাল মাজী ৮৯

ছাত্র শিক্ষকের মামলা- তারাশংকর দত্ত ৯৩

কাঁসা-পেতল শিল্প- ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা ৯৫

‘‘আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্তং তৃপ্যতু।।’’- পি সি সরকারের আশ্চর্য্য প্রচীপ। ১০৩

ভ্রমণ

বিষ্ণুক্ষেত্রম্ নৈমিষারন্যম- ডাঃ সুবোধ চৌধুরী ১০৭

অপরূপ সাতকোশিয়া- প্রিয়ম গুহ ১১১

সিনেমা

বাংলা ছবিতে ভ্রমণ কাহিনি- ড. শঙ্কর ঘোষ ১১৭

খেলা

গলি থেকে রাজপথে ফুটবলার হীরা- মলয় সুর ১২১

হাট-বাজারের আশীর্বাদ

অবশেষ দাস

মা, ওমা স্কুল গাড়ি আসছে না, কেন ? আমি স্কুলে যাব। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না হলে ভাল লাগে? টিচার আসছে না, কতদিন হয়ে গেল! আঁকার আসছে না, কতদিন হয়েগেল! আর কতদিন বাড়িতে থাকতে হবে? বলো না, মা। ওমা। তুমি তো একা নও, সবাই তো আটকে আছে। তো বাবা কতদিন হয়ে গেল, স্কুলে যাচ্ছে না। বাবা তো অঙ্কের মাস্টারমশাই। তোমার বাবা ক্লাশ করতে পারছে না, বলো তো। তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের কথা একটু ভেবে দ্যাখো, বুঝতে। এখন তো লকডাউন চলছে। চারদিকে অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। কত মানুষ মারা যাচ্ছে। শুধু শুধু দোকান খোলা আছে। নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র আছে, যেগুলো ছাড়া চলবে না, সেগুলো কেবলমাত্র খোলা আছে। এই ধরো, মুদিখানা, দুধ, শাকসব্জি, ফলমূল ছাড়া চলবে কিভাবে? তাই খোলা আছে। ব্যাংক খোলা আছে। বেশির ভাগ সবই তো বন্ধ। জীবনের জন্যে সবকিছু, সবার আগে তো বেঁচে থাকতে হবে, বলো? ছোটোদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তো স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। তোমরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। খবরের কাগজ খুললেই শুধু মৃত্যুর খবর। অক্সিজেনের অভাবে কত মানুষ মারা যাচ্ছে!

-অক্সিজেনের অভাব কেন, মা?

-আরে যতটা দরকার, ততটা জোগানো যাচ্ছে না। ভাত-রুটির চেয়ে বেশি দরকারি হয়ে গেছে, এই অক্সিজেন! তুমি যদি বড় হতে তাহলে সবকিছুই বুঝতে পারতে, আমরা এখনও ভাল আছি, এটা ঈশ্বরের মহানুভবতা। সারা পৃথিবী মুক্ত হতে চাইছে। কি যে হবে, বলা যাচ্ছে না।

তুমি ততক্ষণে একটু বই পড়ে নাও। দোতলায় বাবার কাছে যাও। তোমাদের জন্যে একটু খাবার করে দিই। তোমার বাবা চা খাবে বলছিল। একটু পরে আবার তোমার সঙ্গে কথা বলবো। তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেব।

-আচ্ছা, আমি বাবার কাছেই যাচ্ছি।

এক দৌড়ে সে দোতলার ঘরে চলে যায়।

শ্রাবন্তী গলায় জোর বাড়িয়ে বলে, অর্চি, তোমাকে তো বলেছি, ওইভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নেই, পা ফসকে পড়ে গেলে ভয়ঙ্কর কিছু হতে পারে, কথা কেন শোনো না!

অর্চি ক্লাশ ফোরের ছাত্র। বাবা পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়, শহরের নামকরা একটি স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই। মা শ্রাবন্তী গৃহবধূ, উচ্চ শিক্ষিতা। ছেলেকে মানুষ করবার জন্য কখনও চাকরির চেষ্টা করেনি। অর্চির পড়াশুনার সব দায়িত্ব তার কাঁধে। ওর বাবা সময়পেলে একটু আধটু অঙ্কটা দেখে দেয়। সব সময় নয়, মাঝে মধ্যে। শ্রাবন্তী সংসারের সব কাজ সামলে ছেলেকে মনের মতো করে তৈরি করছে। শুধু পড়াশুনা তো নয়, সঙ্গে গান শেখা, ছবি আঁকা, আবৃত্তি কোনো কিছুতেই তার অনীহা নেই। বরং মায়ের কথামতো সে বাঁধাধরা একটা রুটিনের মধ্যে চলে। শনিবার, রবিবার পড়াশুনা থাকলেও খেলাধূলা করবার জন্যে সময়রাখা আছে। এই দুটো দিন বিকেলবেলা অর্চি খেলাধূলা করে। ছুটির দিনগুলোতেও শ্রাবন্তী ছেলেকে খেলাধূলা করতে দেয়। পড়াশুনার দৌড়ঝাঁপে ছেলের শৈশব কোনোভাবে আক্রান্ত হোক, সেটা সে চায়না। বরং ছেলেবেলার টুকিটাকি বিষয়গুলোর প্রতি শ্রাবন্তী বেশ মনোযোগী।

বাড়ির কাছে ছোট্ট একটা পার্ক আছে, ওখানে অনেক ছোটরা এসে হাজির হয়। অর্চি ওদের সঙ্গে খেলাধূলা করে। শ্রাবন্তী ওই সময়টুকু পার্কের বসবার জায়গায় বসে কাটিয়ে দেয়। কখনও কখনও চেনা পরিচিত অন্য মায়েদের সঙ্গে শ্রাবন্তী জমিয়ে গল্প করে। অর্চিকে একটু চোখের আড়াল হতেও দেয়না। কোভিড নাইন্টিন এসে সবকিছু কেমন ওলটপালট করে দিয়েছে। পার্কের মুখ দেখা তো দূরের কথা, পাশের বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও অর্চির আর দেখা হচ্ছে না। খাঁচার পাখির মতো বন্দী জীবন তার একটুও ভাল লাগছে না। একবার বাবাকে একগুচ্ছ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। কখনও রাশি রাশি কৌতূহল নিয়ে হাজির হয় মায়ের কাছে। কখনও কখনও মামার বাড়িতেও ফোন করে ছোটমামাকে। একের পর এক প্রশ্ন ধেয়ে যায়। সব প্রশ্নের উত্তর ছোটমামাও দিতে পারে না। অর্চি, মানে কলকাতার নামকরা একটি স্কুলের ক্লাশ ফোরের ছাত্র অর্চিষ্মান মুখোপাধ্যায় মনের মতো জবাব যখন না পায়, তখন মনটা খারাপ করে দোতলার জানলা দিয়ে আকাশ দেখে। যতদূর চোখ যায়, একমনে তাকিয়ে থাকে। স্কুলের বন্ধুদের জন্যে খুব মন কেমন করে। মামাবাড়ির দিদাকে সে দেখেনি, কতদিন হয়ে গেল। ছোট মাসিমণিকেও কত দিন দেখেনি, সবার জন্যে খুব মন খারাপ করে। একদৌড়ে তার স্কুলে চলে যেতে ইচ্ছে হয়। আঁকার টিচার তাকে খুব ভালবাসেন, তিনিই একমাত্র অর্চিকে পুরো নামে ডাকেন। নামের সঙ্গে বাবু যোগ করে কথা বলেন। কী সুন্দর লাগে! আঁকার স্যারের সেই আদরমাখা কথা।

-অর্চিষ্মান বাবু, তোমার জাহাজ আঁকা হল? এইবার তোমাকে আকাশের নীচে একটা গ্রাম আঁকতে দেব, যে গ্রামে কখনও দুঃখ প্রবেশ করেনি। মৃত্যু প্রবেশ করেনি। সেখানে শুধু আনন্দ, সুখ থৈ থৈ করছে। হৈচৈ করে খেলা করছে।

সবই তো কিছুদিন আগের কথা। অথচ, সবকিছু এখন খুব দূরে মনে হয়। হাত বাড়িয়ে ধরে আনা যায়না। ভুলে থাকাও যায়না। অর্চির কেবলই মনে পড়ে। কোথা থেকে কী হয়েগেল! সবকিছু কেমন অচেনা লাগে! জানলা দিয়েসে রাস্তা দেখতে পায়। পথ চলতি লোকজন মুখে মাস্ক পরে যাতায়াত করে। সবাইকে তার অচেনা লাগে।

চেনা-পরিচিতদেরও ঠিক চেনা যায়না। বাড়ি থেকে বাবা যখন বাজারে যায়, তখনও মুখে মাস্ক লাগিয়ে যায়। মুখ আড়াল করে কেমন যেন মুখোশ পরে নেওযা, একেবারে বেমানান। অর্চি জানে, কোভিডের জন্যে এতকিছুর আয়োজন। স্যানিটাইজার ছাড়া একটুও আর চলা যায়না। কদিনের মধ্যে বাড়ির সবার মতো অর্চিও এসব কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বাড়ির বাইরে না গেলেও বাড়িতেই মাঝে মাঝে খেলাচ্ছলে সে মাস্ক পরে এদিক ওদিক ঘোরে। দোতলায় যায়। দোতলা থেকে নীচের ঘরে আসে। ছাদে পায়চারি করে। কিন্তু বেশিক্ষণ তার ভাল লাগে না।

সে ভাবে, মুখোশের জন্যে মুখ দেখা যায়না। মুখ দেখতে না পেলে মানুষকে ঠিক বোঝা যায়না। হাসলেও বোঝা যায়না। রাগলেও বোঝা যায়না। খুশি থাকলেও বোঝা যায়না। চিন্তিত নাকি উল্লসিত তাও না। কেমন একটা খাপ ছাড়া ভাব!

দোতলার ঘরে এসে অর্চি বলল, বাবা। আমাদের স্কুল আবার কবে থেকে খুলবে?

– কেন? তোমাদের তো ছুটি থাকলেই খুশি হও। ছুটির মজা, ছুটির আনন্দ তোমাদের তো সবচেয়েবেশি। এখন প্রতিদিন ছুটি। প্রতিদিন আনন্দ! তাই তো?

– না বাবা, প্রতিদিন স্কুল বসলে একদিন দু'দিন ছুটি পেলে তখন আনন্দ হয়। এখন তো প্রতিদিন ছুটি, এমন ছুটির আনন্দ নেই। এত ছুটি খুব বোরিং, বাবা।

ঘরে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না। খাঁচার পাখির মতো জীবন। ওরা সারাজীবন খাঁচাতে থাকে। আর আমরা এখন যেন সারাজীবন বাড়িতে!

– অনলাইনে ক্লাশ শুরু হবে, কদিনের মধ্যে। তেমন একটা পরিকল্পনা চলছে।

তখন অনলাইনেই তোমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়েযাবে। গানের ক্লাস, আঁকার ক্লাস সবই অনলাইনে শুরু হবে। তখন অত মন খারাপ করবে না।

– খেলার মাঠ, পার্ক, ক্লাশরুম ছাড়া পড়াশুনা কেমন করে হবে, বাবা?

– সেটা তো সবাই ভাবছে, বড়দেরও তাই মতামত। তবু একটা বিকল্প ভাবনা, ভাবা হচ্ছে। একেবারে সব বন্ধ হয়ে থাকার চেয়ে অনেক ভাল।

বিজ্ঞানীরা তো করোনার টীকা আবিষ্কারের খুব চেষ্টা করছেন। নিশ্চয়ই একটা রাস্তা পাওয়া যাবে। তার আগে অনলাইনে যেটুকু হয, সেটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কোনও উপায় তো নেই। কোথা থেকে ভূতুড়ে রোগ এসে গোটা দুনিয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ঘরে থাকতে কার ভাল লাগে, বলো? তুমি তো একা ঘরে আটকে নেই। আটকে গেছে, সবাই। গোটা পৃথিবী। তুমি আর একটু বড় হলে বুঝতে পারতে কত সমস্যা নিয়ে পৃথিবীর মানুষ এই মুহূর্তে বেঁচে আছে। কত লোকের কাজ চলে গেছে। কলকারখানা বন্ধ। ট্রেন, প্লেন থেকে শুরু করে সব যানবাহন বন্ধ। এমার্জেন্সি পরিষেবা ছাড়া সব বন্ধ! মানুষ যে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। অনেক অসুস্থ মানুষ বাড়িতেই পড়ে আছে। হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার লোক নেই। আমরাও ভয়ে ভয়ে আছি, কখন কি হয়, কে জানে!

– আচ্ছা, বাবা, রাস্তার কুকুর-বিড়ালগুলো তো রাস্তার খাবার খেয়েথাকে। কত কাক, কত পাখি শহরে কিচিরমিচির করে। এখন তো রাস্তার সব খাবার দোকানও বন্ধ, ওরা কি খাচ্ছে?

– তুমি খুব ভাল কথা বললে অর্চি। আমি জানি না, কত পাগল তো পথে ঘুরে বেড়ায, কত ভিখারী আছে, পথে পথে কত মানুষ থাকে। তারা এখন ভাল নেই।

কত মানুষ তো খেতে পাচ্ছে না। কুকুর-বিড়ালের কথা আর কে ভাববে! তবে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে, তারা এদের কথা ভাবছে। কত ভাল ঘরের মানুষ তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাল-ডাল নিচ্ছে। রাঁধা ভাত খেয়ে যাচ্ছে। সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স বজায় রেখে এইসব কিছু চলছে। এই কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে মানুষকে লড়াই করতে হচ্ছে। টিকে থাকতে হচ্ছে। আরও কতদিন এইভাবে চলবে বলা যাচ্ছে না।

– আচ্ছা বাবা, আমরাও তো কিছু মানুষকে খেতে দিতে পারি। বাড়ির সামনের কুকুরগুলোকেও একমুঠো ভাত দিতে পারি। যারা অসুস্থ ওষুধ কিনতে পারছে না, তাদের ওষুধ কিনে দিতে পারি।

– নিশ্চয়ই পারি, কেন নয়। তবে আমাদের সীমিত সামর্থ্য। সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। যতটুকু সম্ভব ততটুকু নিশ্চয়ই করা যায়। আমাদের মতো সবাই এগিয়েএলে

এই কঠিন সময়ে অনেকটা সুরাহা হবে। তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলে কি করা যায়, দেখছি। খুব তাড়াতাড়ি এটা করা হবে। আমিও তো ক'দিন ধরে এটাই ভাবছি। তোমার সুন্দর মনের আলো আরো প্রসারিত হোক। আরো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক।

অর্চি বাবার কথা শুনে খুব আনন্দ পায়। দৌড়ে মাকে ডাকতে চলে যায়।

মা, ওমা বাবা তোমাকে ডাকছে। কোথায় গেলে? তাড়াতাড়ি এসো।

ছেলের হাঁকডাক শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে শ্রাবন্তী বলল, তোমাদের টিফিনটা নিয়ে দোতলায় যাচ্ছি, তুমি ততক্ষণে বাবার কাছে একটু অঙ্ক করো।

কিছুক্ষণ পরেই দোতলায় পার্থপ্রতিমের বসার ঘরে এসে সবকথা শুনে শ্রাবন্তীর চোখে জল চলে এলো। ছোট্ট অর্চিষ্মান ক্লাশ ফোরে পড়ছে। সবে দশ বছর। এরমধ্যে এতকিছু বুঝতে শিখেছে, এতকিছু ভাবতে শিখেছে, অন্যের কষ্টের সমব্যথী হতে চায়, সবকিছু জেনে শ্রাবন্তী চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি।

পরেরদিন দুপুরে মুখুজ্জে বাড়ির দালানে একশো লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। ক্লাবের ছেলেদের কাছে খবর দিতেই বিষয়টি জানাজানি হয়েগেল। পাড়ার কিছু দুঃস্থ মানুষকেও মুখুজ্জে বাড়িতে দুপুরে খেয়ে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ করা হল। আর বিনা আমন্ত্রণেও অনেকেই এসে গেল। পথচলতি ভিখিরি, দুচারটে পাগল ছাড়াও আনকোরা অনেকেই এসে হাজির হল, অর্চিদের দালান-বাড়িতে। তেমন হইচই না হলেও একটা উৎসবের মেজাজ। সবার মুখে মাস্ক। কেউ কেউ নাকের ডগাটা খুলে রেখে এদিকওদিক করছে। লোকজন বেশি নয়, সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স বজায় রেখে একসঙ্গে কুড়ি-পঁচিশজনকে খাওয়ানো হচ্ছে। পুঁই শাক, কুমড়ো দিয়ে ঘন্ট, ডাল, ডিমের ঝোল আর গরম গরম ভাত। সবাই খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছে। আশীর্বাদ করে যাচ্ছে। শ্রাবন্তীর একটু ভয় হচ্ছে, পাচক ঠাকুর তো মাত্র একশ লোকের রান্না করেছে, লোকজন যদি একটু বেশি এসে যায়, কম পড়ে যাবে। কেউ ফিরে গেলে খারাপ দেখাবে।

কিন্তু একশ পঁচিশ জনের মতো লোক এলেও সবাইয়ের খুব ভাল ভাবে হয়ে গেছে। ডিম তো কম পড়ে যাবার আগেই আরও পঁচিশ তিরিশটা ডিম সিদ্ধ করে পরে তেলে ভেজে নিয়ে তরকারিতে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। তাই কোনো অসুবিধা হয়নি। যেটুকু খাবার বেশি হল, সেটুকুও নষ্ট হল কই! পাড়ার কুকুর-বিড়ালগুলো কোথা থেকে খবর পেয়ে অপেক্ষা করছিল। তাদেরও পেটপুরে খাওয়া হল। পাড়ার কাক, ছাতার, শালিকের কপালও মন্দ গেল না, সবার হয়ে গেল।

পার্থপ্রতিম, শ্রাবন্তী মানুষের এইটুকু সেবা করতে পেরে এতটাই আনন্দ পেল যে, তারা ওই দিনেই ঠিক করল, লকডাউনের বাজারে আরও কিছুদিন তারা এইভাবে মানুষকে খাওয়াবে। আহামরি কিছু পাতে দিতে না পারলেও একমুঠো করে ভাত তারা মানুষকে দেবেই। তাদের সিদ্ধান্ত শুনে অর্চি তো নাচতে শুরু করে দিল।

সে বলল, পাড়ার কুকুর-বিড়াল, কাক, ছাতার তো তাহলে কেউ বাদ যাবে না। পাগলগুলোও খেতে পাবে। কী আনন্দ! কী আনন্দ!

শ্রাবন্তী বলল, তুমি যেমন আমার একটা ছেলে, এই দুর্দিনে পাখিগুলোই বা যাবে কোথায়? পাগলগুলোই বা খাবে কোথায়? ওরাও আমাদের ছেলেমেয়ে। তোমার ভাই-বোন। স্কুল বন্ধ থাকলেও তোমার বাবা তো প্রতিমাসে মাইনে পেয়ে যাচ্ছে। এইটুকু করলে আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না। ওদের আশীর্বাদ তোমার মাথায় থাকবে!

পার্থপ্রতিম বলল, মানুষের দেওয়া আশীর্বাদ, অসহায় জীবের দেওয়া শুভকামনা আমাদের অর্চির সঙ্গে থাকলে আগামীদিনে ও অনেকদূর যেতে পারবে, মানুষের সঙ্গে আমাদের থাকতেই হবে।

একটানা একমাস কয়েকদিন এইভাবে মুখুজ্জে বাড়িতে দুপুরে পেটপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা হল, চেনা-অচেনা অনেকেরই। কারও ফিরে যেতে হয়নি। কোনো কোনোদিন তো অতিথির সংখ্যা দেড়শো ছাড়িয়ে গেছে। একদিনের জন্যেও তাদের চোখে মুখে বিরক্ত ফুটে ওঠেনি। বরং পরম তৃপ্তিতে তারা এই আয়োজন করে গেছে, কারও কাছে কোনও সহযোগিতাও চায়নি। এতকিছুর মাঝখানে অর্চি

পড়াশুনাতে কোনো ছেদ পড়েনি। অনলাইনে ক্লাশ করে মায়ের কাছে ঠিক মতো পড়াশুনা করা তার প্রতিদিনের কাজ। বাড়িতে থাকার সুবাদে বাবার কাছে প্রতিদিন অঙ্ক কষা তো তার আছেই! শুধু দুপুরবেলা অতিথিদের খাওয়ার সময় হলে মুখে মাস্ক পরে সকলের গেলাসে জল দেওয়া তার চাই। আর যেদিন টমেটোর চাটনি হতো, সে কচি হাতে একটু একটু করে সবার পাতে চাটনি দিত। খুব মজা পেত।

একদিন মাঝ রাতে তো শ্রাবন্তীর খুব জ্বর। পার্থপ্রতিম দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। এমার্জেন্সি ব্লাড টেস্টে দেখা গেল, কোভিড পজিটিভ। অর্চিদের বাড়ির ত্রিসীমানায় আর কাউকে দেখা গেল না। ভয়েভয়ে অনেকে দূর থেকে খবর নিয়েছে। শ্বাসকষ্টের মাত্রা এমনই বেশি ছিল যে, খুব ভয়ের বিষয় ছিল। পার্থপ্রতিম তো আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। এইটুকু রক্ষে অর্চি আর পার্থপ্রতিম আক্রান্ত হয়নি। অর্চি শুধু ঠাকুরকে ডেকেছে।

জয়মা তারা, আমার মাকে তুমি ভাল করে দাও। মা ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই। বাবা একা কোথায়কী করবে, ঠাকুর! মাকে তুমি ভাল করে দাও।

প্রায় পঁচিশ দিন মরণপণ লড়াই করে শ্রাবন্তী বাড়ি ফিরেছে। অর্চির চোখ দিয়ে অনর্গল জল গড়িয়ে যাচ্ছে। তার ইচ্ছে করছে, দৌড়ে মাযের কাছে গিয়ে মাকে একবার জড়িয়ে ধরবে। মাকে যেন চেনা যাচ্ছে না! দেখছে, মা কেমন রোগা হয়ে গেছে। ডাক্তার নিষেধ করেছেন। তাই দরজার বাইরে বসে ঠায় সে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

পার্থপ্রতিম বলল, অর্চি, বাবা কেঁদো না। মা তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে।

তুমি পড়াশুনায় মন দাও।

অর্চি বলল, এই কদিন আমার আর কারও জন্যে মন কেমন করেনি। স্কুলে না যেতে পারার দুঃখ একটুও হয়নি। আমার শুধু মায়ের জন্যে কান্না পেয়েছে। আমি শুধু কেঁদেছি। মা ছাড়া সব কেমন অন্ধকার। এখন আবার আলো দেখতে পাচ্ছি। বাবা, মা ভাল হয়েযাবে তো?

–নিশ্চয়ই। সবার দেওয়া আশীর্বাদ আছে যে। আমাদের কারো কিচ্ছু হবে না। হাটে–বাজারে কত মানুষ, সবার শুভকামনা আছে তো। মানুষের আশীর্বাদ মিথ্যে হয়না, অর্চি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাড়ির সামনে একটা কদম গাছ থেকে পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। গতবছর রথের মেলা থেকে আনা হাসনুহানা ফুলের গাছে কটা ফুলও ফুটেছে। অর্চি এই কদিন সেদিকে চেয়েও দেখেনি। সে নাচতে নাচতে দৌড়ে গেল, হাসনুহানা গাছের কাছে। চুপিচুপি সে বলল, মা ভাল হয়ে গেছে, এবার সবাই একসঙ্গে থাকা হবে। এইভাবে সবাই একদিন ভাল হয়ে যাবে!

দূরে তখন কোথায় একটা গান বাজছে,

আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে....

With Best Compliments From

Satya Agarwal

Paban Agarwal

Samar Sarani

Kolkata 700 002

শারদীয়া ও দীপাবলী উৎসবকে ঘিরে সারা রাজ্য জুড়ে শুরু হয় নানা আনন্দের অনুষ্ঠান। শিল্পসুষমায় ভরা সৃষ্টিনন্দন প্রতিমা, দৃষ্টিনন্দন মন্ডপসজ্জা, মোহময়ী আলোকসজ্জা কয়েকটা দিনের জন্য হয় নান্দনিক ও বর্ণোজ্জ্বল। পুজোর উৎসবমুখর দিনগুলি আরো সুন্দর ও আনন্দমুখর করে তোলার জন্য রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই শুভেচ্ছা।

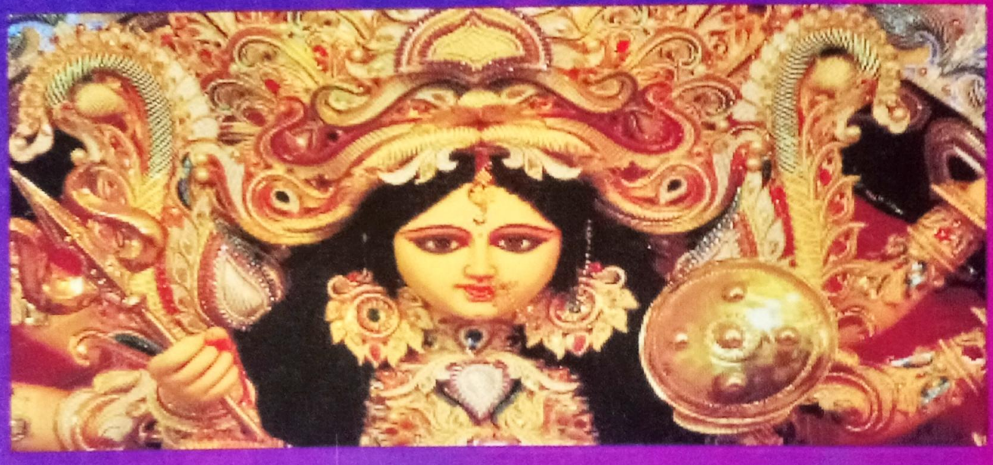

শারদীয়া ও দীপাবলীর প্রীতি–শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

ডাঃ পল্লব দাস

চেয়ারম্যান

রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা